কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৬

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা লুকমান (১২-১৯ আয়াত)

وَ لَقَدۡ اٰتَیۡنَا لُقۡمٰنَ الۡحِکۡمَۃَ اَنِ اشۡکُرۡ لِلّٰہِ ؕ وَ مَنۡ یَّشۡکُرۡ فَاِنَّمَا یَشۡکُرُ لِنَفۡسِہٖ ۚ وَ مَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ

১২. আর অবশ্যই আমরা লুকমান কে হিকমত দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

কোন কোন তাবে'ঈ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লুকমানকে আইয়্যুব আলাইহিস সালাম এর ভাগ্নে বলেছেন। আবার কেউ কেউ তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদ আর-রাবাঈও একথাই বলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, লুকমান চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, তিনি ফাটা পা ও পুরু ঠোঁটবিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। এ বক্তব্যগুলো প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সুদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই উক্ত বক্তব্যগুলোতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। এ ব্যক্তি আসলে বাসিন্দা ছিলেন মাদয়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা অনুযায়ী লুকমান কাঠ চেরার কাজ করতেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি দর্জি ছিলেন।

কোন কোন গবেষক লুকমানকে আদ জাতির অন্তর্ভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। তাদের মতে আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হূদ আলাইহিস সালামের সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্ভবত: এর কারণ হচ্ছে, ইতিহাসে লুকমান ইবন আদ নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কোন কোন গবেষক তাকে এই লুকমান হাকীমই ধরে নিয়েছেন। আল্লামা সুহাইলী এ সন্দেহ অপনোদন করে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়।

লুকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র বা সনদ দুর্বল। ইমাম বগবী বলেন, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। ইবনে কাসীর আরো বলেন, তার সম্পর্কে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ লুকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত বা প্রজ্ঞা-দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তাকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

কাতাদাহ্ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, লুকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। বর্ণিত আছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে লুকমান শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। দাউদ আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয় প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। লুকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন তাবেয়ী বলেন, আমি লুকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যায়ন করেছি। একদিন লুকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি -যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো? লুকমান বলেন, হ্যাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লুকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ-[এক] সর্বদা সত্য বলা, [দুই] অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লুকমান বলেছেন, এমন কতগুলো কাজ আছে যা আমাকে এর স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এইঃ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। [ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, যুগ ও সময়োপযোগী কথা বলা ও কাজ করার যোগ্যতা ইত্যাদি। [তাবারী, ইবন কাসীর বাগভী]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফারী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান, কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্জ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ

১৩. আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম।

জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতার ব্যাপারে কথা বলা। সে জন্য লুকমানের সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ কে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহর কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, "হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর অংশীদার স্থির করো না, অংশীদার স্থাপন করা গুরুতর যুলুম। জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শির্ক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই। তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে।

তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং এই সঙ্গে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক যুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও যুলুমমুক্ত নয়। পক্ষান্তরে মুমিন এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্ত। হাদীসে এসেছে, যখন নাযিল হল "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ ঘটায়নি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা।" [সূরা আল-আন'আম: ৮২] তখন সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত ভীত হয়ে গেলেন; (কারণ তারা যুলুমের আভিধানিক অর্থ ধরে নিয়েছিলেন)। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের কেউ কি এমন আছে যে, যার ঈমানের সাথে যুলুম নেই? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা সেই যুলুম নয় (যার ভয় তোমরা করছ)। তোমরা কি শুননি লুকমান তার ছেলেকে কি বলেছে, তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম। [বুখারী: ৪৭৭৬]

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰى وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِىۡ وَ لِوَالِدَيۡكَ ؕ اِلَىَّ الۡمَصِيۡرُ

১৪. আর আমরা মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।

আল্লাহ তা'আলার হকের পর বান্দার মাঝে যারা বেশি হকদার তাদের হক সম্পর্কে সচেতন করছেন। তারা হলেন পিতা-মাতা। তিনি তাঁর ছেলেকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য নসীহত করলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোরালো আদেশ করেছেন। এমনকি কুরআনে প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলার অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকারের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত কর না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উফ্' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩)

এখানে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস গর্ভ ধারণ, প্রসব বেদনা, লালন-পালন, দুধ পান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তবে পিতা-মাতা যদি এমন কোন বিষয়ের নির্দেশ দেয় যা বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের কথা মানা যাবে না। তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। এমনকি তাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا) "এবং বল: 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩-২৪)

وَ اِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنۡ تُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَ صَاحِبۡهُمَا فِى الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۟ وَّ اتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

১৫. আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবিহিত করব।

অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়। অথবা তুমি আমার কোন শরীক আছে বলে জান না। তুমি তো শুধু এটাই জান যে, আমি এক, আমার কোন শরীক নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে তুমি তোমার পিতা-মাতার কথা মানতে পার? অন্যায়কে যেন তুমি প্রশ্রয় না দাও। শির্ক গুরুতর অপরাধ হওয়ার কারণেই আল্লাহর নির্দেশ এই যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ

রয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্যে সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করার পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না।

যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়। যেমনটি হয়েছিল, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার মায়ের আচরণ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার মা শপথ করলেন যে, যতক্ষণ তুমি আবার পূর্ববর্তী দ্বীনে ফিরে না আসবে ততক্ষণ আমি কোন খাবার গ্রহণ করবনা। কিন্তু সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এ কথা মান্য করলেন না। তার সমর্থনেই এই আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম: ১৭৪৮]

যদি পিতা-মাতা আল্লাহর অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ হল তাদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক — প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশীদার স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে যে, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না।

তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। [কুরতুবী, তাবারী, সা'দী]

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

১৬. হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

তৃতীয় উপদেশ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্মদর্শীতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: হে বৎস! তুমি যে আমলই করা না কেন যদি তা সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা যদি শিলাগর্ভে বা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে থেকে থাকে তাহলেও তা হাযির করে তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। এর দ্বারা তিনি ছেলেকে সতর্ক করছেন যাতে কখনো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও পাপ কাজে লিপ্ত না হয়। আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি কোন জুলুম করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও সেটা আমি উপস্থিত করব; হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়াহ ২১:৪৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযালা ৯৯:৭-৮)

সুতরাং মানুষ গোপনে বা প্রকাশ্যে যত ভাল আর খারাপ কাজ করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তা কিয়ামতের দিন অবশ্যই উপস্থিত করবেন।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

১৭. হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর তোমার উপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ করা। নিশ্চয় এটা অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

চতুর্থ উপদেশ হল কর্ম পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে।

এতে তিনটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে:

প্রথম আলোচ্য বিষয়: আল্লাহ তা'আলার বাণী: {يابني أقم الصلاة} (হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো)। তিনি তাঁর পুত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর ওসিয়ত করেছেন, আর তা হলো—সালাত, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি প্রথমে নিজে এগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। এখানে যাবতীয় ইবাদত ও فضائل (উত্তম গুণাবলি) একত্রিত হয়েছে। মানুষ যত আমল করে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সালাত। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি সালাত কায়েম কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও, আদায় না করা অবস্থায় দশ বছর বয়সে পৌঁছলে প্রহার কর এবং বিছানা আলাদা করে দাও। (আবূ দাউদা হা: ৪৯৫, সহীহ)

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: আল্লাহ তা'আলার বাণী: {واصبر على ما أصابك} (এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো)। এই আয়াতটি অন্যায় পরিবর্তনে উৎসাহিত করে, যদিও এর কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, অন্যায় পরিবর্তনকারীকে কখনো কখনো কষ্টের শিকার হতে হয়। এই পরিমাণ ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) এবং দৃঢ়তার পরিচায়ক। তবে এটি অপরিহার্য পর্যায়ের (বাধ্যতামূলক) নয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে ইমরান ও সূরা মায়িদাহ-তে গত হয়েছে। আরেকটি মত হলো, এখানে তাঁকে দুনিয়ার কঠিন বিপদাপদ, যেমন—রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির উপর ধৈর্য ধারণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি অধৈর্য হয়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নাফরমানিতে লিপ্ত না হন। এই মতটি অত্যন্ত উত্তম, কারণ এটি ব্যাপক অর্থ ধারণ করে।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়: আল্লাহ তা'আলার বাণী: {إن ذلك من عزم الأمور} (নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: "ধৈর্য ধারণ করা حقيقى ايمان (প্রকৃত ঈমান)-এর অংশ।" বলা হয়েছে যে, সালাত কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করাই হলো `عزم الأمور` (দৃঢ় সংকল্পের কাজ)। অর্থাৎ, এগুলো এমন কাজ যা আল্লাহ দৃঢ়ভাবে নির্ধারণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। এটি ইবনু জুরাইজ (রহঃ)-এর মত। আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ হলো, এগুলো হলো উত্তম চরিত্র এবং মুক্তি ও নাজাতের পথে অবিচল দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য। তবে ইবনু জুরাইজের মতটিই অধিকতর সঠিক।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

১৮. আর তুমি মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে তোমার গাল বাঁকা কর না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

পঞ্চম উপদেশ সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, বলা হয়েছে যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না-যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। এর আরেক অর্থ হলো, মানুষের প্রতি গাল বাঁকা করে কথা বলো না। এ অর্থ অনুসারে তার প্রতি তাকিয়েও যদি গাল বাঁকা করে তাকে অপমান করা উদ্দেশ্য হয় তবে তাও নিষিদ্ধ হবে। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সহিত বিচরণ করো না। আল্লাহ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা করা-নিজের নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। আল্লাহ কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান ঈমান আছে সে জাহান্নামে যাবে না, পক্ষান্তরে যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না।' [মুসলিম: ১৩২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আর তিনজনকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, অহংকারী, দাম্ভিক। যেমন তোমরা আল্লাহর কিতাবে পাও, তারপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আর দান করে খোঁটা প্রদানকারী কৃপণ ব্যক্তি; এরং শপথের মাধ্যমে বিক্রয়কারী। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৭৬]

'মুখতোল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর 'ফাখুর' তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। [ইবন কাসীর] মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়। [ফাতহুল কাদীর]

وَ اقْصِدْ فِیْ مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ

১৯. আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} (তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো)। যখন আল্লাহ তাকে নিন্দনীয় চরিত্র থেকে নিষেধ করলেন, তখন তিনি তাকে সেই উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিলেন যা তার অবলম্বন করা উচিত। তাই তিনি বললেন: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} অর্থাৎ, হাঁটার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। 'কাসদ' (القصد) হলো দ্রুত ও ধীরগতির মাঝামাঝি অবস্থা। অর্থাৎ, চলন যেন এমন ধীর গতির না হয়, যাতে দেখে অসুস্থ মনে হয় এবং এমন দ্রুত গতিরও না হয়, যা সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী হয়। এ কথাকে অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, (يَمْشُوْنَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا) "(আল্লাহর বান্দাগণ) পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।" (সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)

{وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ} (এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো) অর্থাৎ, তা থেকে কিছু কমাও। এর অর্থ হলো, কষ্ট করে আওয়াজ উঁচু করো না, বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করো। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথা বলা একটি কষ্টকর কাজ যা অন্যকে কষ্ট দেয়। এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো বিনয় প্রকাশ করা।

{إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} (নিশ্চয়ই সবচেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হলো গাধার স্বর) অর্থাৎ, সবচেয়ে কদর্য ও ভীতিকর আওয়াজ। যেমন বলা হয়: "সে একটি 'মুনকার' (অপরিচিত বা কুৎসিত) চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।" গাধা হলো চরম নিন্দা ও তিরস্কারের উদাহরণ, তার ডাকও তেমনি। আরবরা গাধার নাম সরাসরি উল্লেখ করাকে এতটাই অপছন্দ করত যে, তারা এর পরিবর্তে উপনাম ব্যবহার করত এবং সরাসরি নাম বলতে চাইত না। তারা বলত: "লম্বা কানওয়ালা"। যেমনটি অন্যান্য ঘৃণিত জিনিসের ক্ষেত্রে উপনাম ব্যবহার করা হয়। এমনকি সম্ভ্রান্ত লোকদের মজলিসে গাধার নাম উল্লেখ করাকে শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। কোনো কোনো আরব গোত্র পায়ে হেঁটে চলার কষ্ট হলেও আত্মসম্মানবোধের কারণে গাধার উপর আরোহণ করত না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য গাধার উপর আরোহণ করতেন।

এই আয়াতে কথোপকথন ও বিতর্কের সময় উচ্চস্বরে কথা বলার কদর্যতাকে গাধার আওয়াজের কদর্যতার মাধ্যমে বোঝানোর প্রমাণ রয়েছে। কারণ গাধার আওয়াজ অনেক উঁচু হয়। সহীহ হাদিসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা গাধার ডাক শোনো, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ সে একটি শয়তানকে দেখেছে।" [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]। আরও বর্ণিত হয়েছে: "যখনই কোনো গাধা ডাকে বা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, তা কেবল শয়তানকে দেখেই করে।" সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন: "গাধার ডাক ছাড়া প্রতিটি বস্তুর চিৎকারই তাসবীহ।" 'আতা (রহঃ) বলেন: "গাধার ডাক হলো জালিমদের বিরুদ্ধে বদদোয়া।"

এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি শিষ্টাচার শিক্ষা, যা মানুষকে অবজ্ঞা করে তাদের মুখের উপর চিৎকার করা থেকে বিরত থাকতে বলে, অথবা সাধারণভাবে চিৎকার করা থেকে বিরত থাকতে বলে। আরবরা উচ্চ ও জোরালো কণ্ঠস্বর নিয়ে গর্ব করত। তাদের মধ্যে যার কণ্ঠস্বর যত বেশি জোরালো হতো, সে তত বেশি সম্মানিত হতো, আর যার কণ্ঠস্বর নিচু হতো, সে তত বেশি হীন বিবেচিত হতো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই জাহেলী চরিত্রকে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে নিষেধ করেছেন: {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}। অর্থাৎ, যদি কোনো প্রাণীকে তার আওয়াজের জন্য ভয় পাওয়ার মতো হতো, তবে তা হতো গাধা। আল্লাহ তাদের উভয়কে (উচ্চস্বরে চিৎকারকারী ও গাধা) উপমায় সমান করে দিয়েছেন।

ফুটনোট

লুকমান (আঃ)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ: এক আদর্শ জীবনবিধান

মহাবিশ্বের এই বিশাল বর্ণনার পর, সূরাটি তার কেন্দ্রীয় চরিত্র–হাকিম বা প্রজ্ঞাবান লুকমান (আঃ)-এর দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ তাঁকে প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, তা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এক আদর্শ জীবনবিধান হিসেবে কাজ করে।

তাঁর উপদেশের মূল ভিত্তি ছিল "আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা"। এরপর তিনি তাঁর পুত্রকে ধাপে ধাপে কিছু অমূল্য উপদেশ দেন:

- **সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ: শিরক থেকে মুক্তি**
  "হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক এক মহা জুলুম।"
- **পিতামাতার অধিকার:**
  "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।" তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।
- **আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি:**
  "হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি কোনো বস্তু সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা কোনো পাথরের ভেতরে, আকাশে বা পৃথিবীতে লুকিয়ে থাকে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন।"
- **চরিত্র গঠনের নির্দেশনা:**
  - "সালাত কায়েম করো।"
  - "সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে বাধা দাও।"
  - "বিপদে ধৈর্যধারণ করো।"
- **সামাজিক আচরণের নীতিমালা:**
  - "অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না।"
  - "নিজের চাল চলনে সংযম অবলম্বন করো।"
  - "এবং নিজের কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখো। নিশ্চয়ই কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।"

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদেরকে লুকমান (عليه السلام)-এর মত উপদেশ প্রদান করা।

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। কেননা শির্ক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ।

৩. আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৪. কিয়ামতের মাঠে মানুষের সমস্ত আমল উপস্থিত করা হবে এবং সেই অনুপাতে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

৫. প্রতিটি পিতা-মাতা সন্তানকে সালাত কায়েম করার, সৎ কাজের আদেশ করার, অসৎ কাজে বাধা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিবে।

৬. অহংকার পতনের মূল, তাই কোন প্রকার অহঙ্কার করা যাবে না।

৭. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

৮. সংযতভাবে চলা ফেরা করতে হবে।

৯. উচ্চকণ্ঠে নয় বরং নম্রভাবে কথা বলতে হবে।